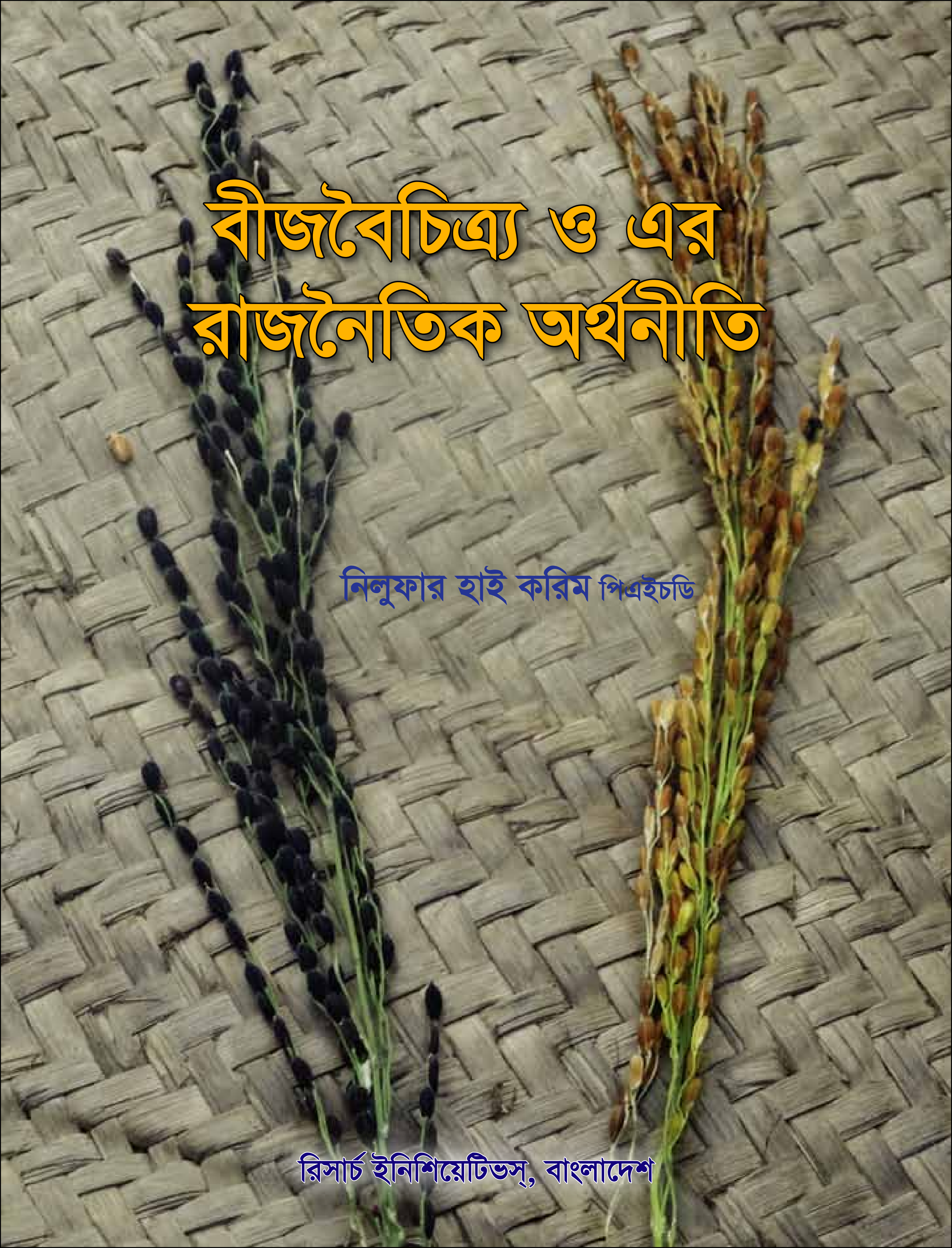

বীজবৈচিত্র্য ও এর রাজনৈতিক অর্থনীতি

নিলুফার হাই করিম পিএইচডি

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ

বীজবৈচিত্র্য ও এর রাজনৈতিক অর্থনীতি

নিলুফার হাই করিম পিএইচডি

RESEARCH
INITIATIVES
BANGLADESH

ROSA
LUXEMBURG
STIFTUNG
SOUTH ASIA

বীজবৈচিত্র্য ও এর রাজনৈতিক অর্থনীতি | Seed Diversity & It's Political Economy

নিলুফার হাই করিম পিএইচডি | Nilufer Hye Karim PhD.

প্রকাশকাল: ডিসেম্বর, ২০১৭ | Published in: December, 2017

প্রকাশনায়:
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্‌, বাংলাদেশ (রিইব)
বাসা ৫৪ (৩এ), সড়ক ১১, ব্লক এফ,
বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
ফোনঃ (+৮৮০-২) ৫৫০৪২৩৪৫-৬
Email: rib@citech-bd.com
Website: www.rib-bangladesh.org

Published by:
Research Initiatives, Bangladesh (RIB)
House 54 (3A), Road 11, Block F,
Banani, Dhaka- 1213, Bangladesh
Phone: (+880-2) 55042345-6
E-mail: rib@citech-bd.com
Website: www.rib-bangladesh.org

সহায়তায়:
রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফ্টুং
ফ্রাঞ্জ-মেহ্‌রিং-প্লাটজ্‌ ১
১০২৪৩, বার্লিন, জার্মানী
Website: www.rosalux.de
www.rosalux-southasia.org

Supported by:
Rosa Luxemburg Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin, Germany
Website: www. rosalux.de
www.rosalux-southasia.org

মুদ্রণে:
ডানা প্রিন্টার্স লিমিটেড
গ-১৬, মহাখালী, ঢাকা-১২১৩

Printed by:
Dana Printers Limited
Ga-16, Mohakhali, Dhaka-1213

Sponsored by the Rosa Luxemburg Foundation e.V. with funds of the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development of the Federal Republic of Germany

Gefördert durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V. aus Mitteln des Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland

কৃতজ্ঞতাস্বীকার

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) জার্মানীর রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফ্টুং (আরএলএস)-এর সহায়তায় গত ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশে বিভিন্ন ইস্যুতে গবেষণা পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালে রিইব কাজ করছে 'প্রান্তিয় জনগোষ্ঠীর কৃষি-প্রতিবেশ: শিক্ষণ ও গণগবেষণা' বিষয়ে। যার বিষয়বস্তু কৃষি-প্রতিবেশ, বিকল্প কৃষি, জৈব কৃষি ইত্যাদি এবং এ সংক্রান্ত জ্ঞানের অন্বেষণ ও কৃষক সমাজে গণগবেষণার মাধ্যমে এর চর্চা করা।

এই বইটি মূলত একটি শিক্ষামূলক প্রকাশনা। বীজ বিষয়ক বিভিন্ন বই ও প্রতিবেদন থেকে তথ্যাবলী ও ছবি সংগ্রহ করে বইটি লেখা হয়েছে, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সহকর্মী মো: ইফতেখার আলীকে বই এর প্রাথমিক খসড়া থেকে অনুবাদ করে দেওয়া এবং প্রচ্ছদের ছবিটির জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এছাড়া আমাদের সুহৃদ পার্টনার রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফ্টুং (আরএলএস)-এর রেসিডেন্ট রিপ্রেজেনটেটিভ স্টেফান মেন্টশেল এবং প্রোগ্রাম ম্যানেজার বিনোদ কষ্টি-কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি অকৃত্রিম সহযোগিতার জন্য।

রিইব চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি, নির্বাহী পরিচালক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, প্রকল্প সমন্বয়কারী সুরাইয়া বেগম এবং এই প্রকল্পের কর্মীসহ রিইব-এর সহকর্মীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি বইটি প্রকাশে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো-র প্রতি তাদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য।

আশা করি কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এই বই থেকে উপকৃত হবে।

নিলুফার হাই করিম পিএইচডি
রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব)।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : বীজবৈচিত্র্য বিষয়ক রাজনৈতিক অর্থনীতি

১. ভূমিকা ১
২. কিভাবে বীজবৈচিত্র্য হারিয়ে গেল ১
৩. বীজের সার্বভৌমত্ব ২
৪. কেন বীজ সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে ৩
৫. যেসব আইন কৃষকের স্বাধীনতা হরণ করে ৩
 ৫.১ পেটেন্টিং, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট এবং বীজের স্বাধীনতার খর্ব ৩
 ৫.২ পেটেন্ট ও আইপিআর-এর প্রভাব ৪
 ৫.৩ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ৫
৬. জিএমও বীজের আবির্ভাব ৫
৭. জিএমও বিষয়ক সমালোচনা ও রাজনীতি ৬
৮. বীজ যুদ্ধ ও বীজের সার্বভৌমত্ব হরণ ৬
৯. বীজ অধিকার বিষয়ক পদক্ষেপসমূহ ৭

দ্বিতীয় অধ্যায় : বীজ বিজ্ঞান

১. ভূমিকা ১১
২. বীজ ১১
৩. ফুল ১১
৪. পরাগায়ন ১৩
 ৪.১ স্ব-পরাগায়ন ১৩
 ৪.২ পর-পরাগায়ন ১৩
৫. বীজের প্রকারভেদ ১৪
 ৫.১ স্থানীয় বা দেশীয় বীজ ১৫
 ৫.২ উচ্চ ফলনশীল বীজ ১৫
 ৫.৩ হাইব্রিড বীজ ১৭
 ৫.৪ জিনগত পরিবর্তিত বীজ ১৭
৬. টিস্যু কালচার ১৮
৭. বীজ ও এগ্রোইকোলজি ১৯
৮. উপসংহার ১৯

প্রথম অধ্যায়

বীজবৈচিত্র্য বিষয়ক রাজনৈতিক অর্থনীতি

১. ভূমিকা

আদিকাল থেকেই কৃষকরা বিভিন্ন শস্য ও অশস্যের বীজ বছরের পর বছর চাষ ও সংরক্ষণ করছেন। নিজস্ব ক্ষেতের প্রয়োজনীয় বীজ সংরক্ষণ ও এলাকার অন্যান্য কৃষকদের সাথে বীজ বিনিময় করার পূর্ণ স্বাধীনতাও তার ছিল। প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষকরা বিভিন্ন প্রজাতি ও জাতের বীজ বাছাই, সংগ্রহ, চাষ ও সংরক্ষণ করে জীববৈচিত্র্য রক্ষা করছেন এবং তার প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা নিশ্চিত করছেন। কৃষকের কাছে বীজ হচ্ছে এক মহামূল্যবান সম্পদ, যা সে নিজ দায়িত্বে ও পরম মমতায় পরবর্তিতে চাষের জন্য সংরক্ষণ করেন। বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায় সবুজ বিপ্লব শুরু হওয়ার আগে ভারতীয় উপমহাদেশে শুধু ধানেরই ৪২,০০০-এর বেশি জাত চাষ হত।[১] ফিলিপাইনে আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইন্সটিটিউটের (ইরি) জিন ব্যাংকে শুধু বাংলাদেশের ৮,০০০-এর বেশি ধানের ঐতিহ্যবাহী জাত সংরক্ষিত আছে।[২] এই ঐতিহ্যবাহী জাতগুলো থেকেই আধুনিক উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাত সৃষ্টি করা হয়েছে।

২. কিভাবে বীজবৈচিত্র্য হারিয়ে গেল

জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে ষাটের দশক থেকে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সবুজ বিপ্লবের প্রযুক্তিসমূহ (উচ্চ ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক, সেচ সরঞ্জাম প্রভৃতি) বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করা হয়। প্রথমে গ্রহণ করতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগলেও, পরবর্তিতে উৎপাদনের পরিমানের পার্থক্য দেখে ক্রমে কৃষকরা সবুজ বিপ্লবের প্রযুক্তিগুলো ব্যবহার করতে শুরু করে। উচ্চফলনশীল ও হাইব্রিড বীজ চাষের ফলে কিছু নির্দিষ্ট ফসলের উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়ে যায় কিন্তু বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া শুরু হয় স্থানীয় নানান জাতের শস্যের বীজবৈচিত্র্য। আর বীজবৈচিত্র্য হারিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি সেসকল জাত বা বীজের চাষাবাদ ও দৈনন্দিন জীবনে এগুলোর ব্যবহার সংক্রান্ত জ্ঞানও হারিয়ে যাচ্ছে।

আমাদের কৃষিক্ষেত থেকে এই বীজবৈচিত্র্য হারিয়ে গেলেও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান— যেমন ইরি (International Rice Research Institute), আইবিপিজিআর (International Board of Plant Genetic Resource), আইএআরসি (International Agricultural Research Centre) প্রভৃতি- এই বীজগুলো সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করছে। এছাড়া বিভিন্ন দেশের সরকারি ও বেসরকারি ব্যবস্থাপনায়ও স্থানীয় বীজ সংরক্ষণ করা হয়। নরওয়ে নিজস্ব অর্থায়নে স্পিটস্‌বার্গেন দ্বীপের বরফের নিচে একটা বীজ ব্যাংক স্থাপন করেছে, যেখানে নয় লক্ষের বেশি বীজের নমুনা সংরক্ষণ করা হচ্ছে, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক 'সংকট' থেকে বীজবৈচিত্র্য রক্ষার

জন্য। সিজিআইএআর (Consultative Group on International Agricultural Research) এর সহায়তায় স্থাপিত এই বীজ ব্যাংক পৃথিবীর ১,৭৫০ টি বীজ ব্যাংকের 'ব্যাকআপ' হিসেবে কাজ করবে।[৩]

বরফের নিচে স্থাপিত নরওয়ের বীজ ব্যাংকের প্রবেশপথ

Source: https://www.regjeringen.no/en/topics/food-fisheries-and-agriculture/svalbard-global-seed-vault/id462220/

অর্থাৎ এই বীজবৈচিত্র্য আমাদের কৃষিক্ষেত থেকে হারিয়ে গেলেও, বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ পরম যত্নে এগুলো সংরক্ষণ করছে। যদিও এ বীজ ব্যাংকগুলোর অনেক বীজই স্বাভাবিক অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা হারিয়েছে।[৪] এখন প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের কৃষকরা কি ঐ বীজ ব্যাংকগুলোর সাথে কখনও যোগাযোগ করতে পারবে, নাকি এর ফলে শুধু উপকৃত হবে বীজ প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলো? আমাদের আদি কৃষকদের সৃষ্ট এসব বীজের বংশগত বৈশিষ্ট্য থেকেই এখনকার জাতগুলো বের করা হয়, যার মালিকানা থাকে মূলত বিভিন্ন কোম্পানির হাতে।

কৃষির শুরু হয় বীজ দিয়ে, আর বীজ থেকেই আমাদের খাদ্য ও জীবন ধারণের অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদন হয়। অর্থাৎ বীজের নিয়ন্ত্রণ যার হাতে থাকে, সে পুরো কৃষি ব্যবস্থা ও মোট খাদ্য উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তাই পৃথিবীব্যাপী অনেকেই মনে করেন যে 'স্বাস্থ্যকর, সমতাভিত্তিক ও স্থিতিশীল খাদ্য উৎপাদনের জন্য বীজ সংগ্রহ, চাষ, সংরক্ষণ এবং বিনিময়ের স্বাধীনতা ও এ সংক্রান্ত আইনগত বাধা অপসারণ জরুরি'[৫], অর্থাৎ বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানির হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ও এ সংক্রান্ত আইন দ্বারা আরোপিত বীজের উপর নিষেধাজ্ঞা বিলোপ করা দরকার যাতে বীজের উপর কৃষকের সার্বভৌমত্ব হারিয়ে না যায়।

৩. বীজের সার্বভৌমত্ব

দ্যা লেক্সিকন অফ ফুড- এর মতে বীজের সার্বভৌমত্ব হচ্ছে- 'বীজের পরবর্তী প্রজন্ম রক্ষা এবং অন্য কৃষকের সাথে মুক্তভাবে বিনিময়ের মাধ্যমে বীজ সংরক্ষণের অধিকার কৃষকের থাকবে, এবং ঐ বীজ কোন কোম্পানির মালিকানাভুক্ত বা প্যাটেন্টড বা জিনগতভাবে পরিবর্তিত নয়'।[৬] এখন বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানি যারা রাসায়নিক সার, কীটনাশক, বালাইনাশক প্রভৃতি উৎপাদন করে, তারা তাদের মালিকানাভুক্ত বীজের চাষের জন্য উৎসাহ যোগাচ্ছে এবং এ খাতে ব্যাপক মুনাফা অর্জন করছে। এ পরিস্থিতি পৃথিবীব্যাপী অনেক বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী ও কর্মীদের -যারা মনে করেন যে কৃষকরাই বীজের মালিক এবং মূল খাদ্য যোগানদার- মাঝে আলোড়ন তুলেছে। ফলে বীজকে কিছু কোম্পানির কুক্ষিগত করার জন্য যেসব আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা ও প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে। আসলে বীজের উপর কৃষকের পরিপূর্ণ মালিকানা ও অধিকারই হচ্ছে বীজের সার্বভৌমত্ব। ড. বন্দনা শিবা ভারতে 'নবধান্য' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেছেন।[৭]

৪. কেন বীজ সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে

জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে বীজ বিক্রয় সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন প্রণয়ন বা গ্রহণ করা হচ্ছে। এই আইনগুলো বীজের মালিকানার ক্ষেত্রে কৃষকদেরকে অন্তর্ভূক্ত করছে না, এমনকি আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় নাগরিক সমাজেরও অংশগ্রহণ থাকছে না। এই আইনগুলো প্রণয়নের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোম্পানির প্রস্তুতকৃত ও মালিকানাভুক্ত বীজের যাতে দ্রুত প্রচার হয় এবং বীজের উপর পুরোপুরি কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ থাকে।

৫. যেসব আইন কৃষকের স্বাধীনতা হরণ করে

আমেরিকাতে সর্বপ্রথম পেটেন্ট আইন চালু করা হয়। এ আইনে যে কোন আবিস্কারক তার বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের উপর নিরঙ্কুশ মালিকানা লাভ করেন, অর্থাৎ অন্য কেউ তার এই আবিস্কৃত পদ্ধতি বা বস্তু/দ্রব্য বিনা অনুমতিতে ব্যবহার করতে পারবে না। এক্ষেত্রে আবিস্কারককে সরকারের কাছ থেকে একটি লাইসেন্স নিতে হয়। আগে এই আইনে বীজ অন্তর্ভূক্ত ছিল না, কিন্তু পরবর্তিতে বীজ ব্যবসায়ী কোম্পানির প্ররোচনায় বীজকে এই আইনের অন্তর্ভূক্ত করা হয়, যা বীজের মুক্ত বিনিময়কে সীমিত করে ফেলে। এর ফলে বীজের উপর কৃষক সমাজের মালিকানা ও মুক্ত বিনিময়ের চর্চার উপর আইনি খড়গ নেমে আসে।

৫.১ পেটেন্টিং, ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট এবং বীজের স্বাধীনতার খর্ব

১৭৯০ সালের ১০ই এপ্রিল আমেরিকার কংগ্রেস কর্তৃক পেটেন্ট আইন প্রবর্তিত হয়, যার শিরোনাম ছিল- An act to promote the progress of useful arts। সর্বপ্রথম স্যামুয়েল হপকিন্স-কে পটাশিয়াম কার্বনেট প্রস্তুত করার একটি পদ্ধতির পেটেন্ট দেওয়া হয় ঐ বছরের ৩১শে জুলাই। আইনগত দিক থেকে এই পেটেন্ট পাওয়ার অর্থ হচ্ছে ঐ পদ্ধতিটি অন্য কেউ অনুমতি ছাড়া কোন রকমভাবে ব্যবহার করতে পারবে না। এই পেটেন্ট লাইসেন্সটি সাধারণত ২০ বছরের জন্য দেওয়া হয় নির্দিষ্ট চার্জ গ্রহণের মাধ্যমে। পরবর্তিতে পেটেন্ট লাইসেন্সটি রিনিউ করা যায়। যদিও আগে পেটেন্ট ও আইপিআর আইন প্রযোজ্য ছিল শুধু রাসায়নিক ও মেকানিক্যাল দ্রব্যের ও পদ্ধতির উপর, কিন্তু পরবর্তিতে কোম্পানিগুলো প্রাণ ও বীজকেও এর অন্তর্ভূক্ত করে ফেলে। পেটেন্টের মাধ্যমে কোন

ভারতের সেন্টার ফর ইন্টারডিসিপ্লিনারি স্টাডিজ প্রকাশিত ধানের বীজবৈচিত্র্যের পোস্টার

পদ্ধতি, প্রাণ বা আবিস্কৃত বস্তুর উপর রাষ্ট্রের কাছ থেকে একচ্ছত্র মালিকানা পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে এভাবে আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য বা সম্পদের উপর থেকে জনগণের নিয়ন্ত্রণ চলে যায়।

বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার উরুগুয়ে রাউন্ডের (১৯৮৬-৯৪) আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি রাইট (আইপিআর) এর শর্তগুলো গৃহিত হয়। এছাড়া এর ফলে প্রাণ ও বীজকেও ট্রেডমার্ক, পেটেন্ট, ব্র্যান্ড, লোগো ব্যবহারের মাধ্যমে মালিকানাভুক্ত করে ফেলা হয়। যদিও অনেকেই প্রাণের উপর পেটেন্ট আরোপ করার বিরোধিতা করেছিলেন এবং এ প্রেক্ষিতে ১৯৯৯ সালে এই সিদ্ধান্তগুলো পর্যালোচনা করার কথা ছিল, কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। এর ফলশ্রুতিতে এখন মাত্র পাঁচটি কোম্পানি ইউরোপের ভূট্টার বীজের ৭৫ শতাংশ ও সবজি বীজের ৯৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে।

১৯২৪ সালে পাইওনিয়ার কোম্পানি সর্বপ্রথম ভূট্টার হাইব্রিড বীজ বিক্রি শুরু করে।[৮] পরবর্তীতে ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে এরকম বিভিন্ন কোম্পানি হাইব্রিড বীজ উৎপাদন ও বিক্রি করা শুরু করে। এই বীজ ব্যবহারের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও, এর অন্যতম একটা নেতিবাচক প্রভাব ছিল উদ্ভিদের জাতবৈচিত্র্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি পেটেন্ট আইন ব্যবহার করে বীজের মালিকানা নিতে শুরু করে। যার চূড়ান্ত রূপ কোম্পানি কর্তৃক জিনগত পরিবর্তিত জীব (জিএমও) বা বীজ বাজারজাত করা।

৫.২ পেটেন্ট ও আইপিআর-এর প্রভাব

বীজ বা প্রাণের ক্ষেত্রে পেটেন্ট ও আইপিআর সংক্রান্ত আইনের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব রয়েছে। ড. বন্দনা শিবার মতে[৯],

ক. বীজ সাধারণত প্রাকৃতিকভাবেই প্রজন্মের পর প্রজন্ম টিকে থাকে, তাই পেটেন্টের মাধ্যমে কর্পোরেট গোষ্ঠীকে বীজের উপর নিয়ন্ত্রণ দেওয়াটা অনৈতিক।

খ. যেহেতু বীজ কৃষক সমাজের কাছেই হাজার বছর ধরে ছিল, তাই এসব বীজ ব্যবহার করে পেটেন্ট ও আইপিআর এর আওতায় নতুন বীজের লাইসেন্স নেওয়া এক অর্থে জৈব-জালিয়াতি (বায়োপাইরেসি)।

গ. বীজের উপর কোম্পানির লাইসেন্স, কৃষককে তার প্রয়োজনীয় ও পছন্দসই বীজ ব্যবহারের মুক্ত অধিকারকে খর্ব করে।

ঘ. এর ফলে কোম্পানিগুলো কৃষকের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারে।

ঙ. কোম্পানি প্রবর্তিত জিনগতভাবে পরিবর্তিত বীজ, কৃষকের বিভিন্ন প্রজাতির অন্যান্য জাতের বীজকে দূষিত করতে পারে।

এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে মনস্যান্টো, সিনজেনটা ও ডুপন্টে-র মত কোম্পানিগুলো ক্রমে এমন পর্যায়ে যাবে যে, তারাই ঠিক করে দেবে, পৃথিবীব্যাপি কি খাদ্য উৎপাদন হবে ও কতটুকু হবে। এছাড়া কৃষি-প্রাণবৈচিত্র্য/ বা কৃষি-জীববৈচিত্র্য (agro-biodiversity) হারিয়ে যাবে এবং এই কোম্পানিগুলোই ঠিক করবে যে কোন কোন শস্য বা অশস্য টিকে থাকবে। এখানে উল্লেখ্য যে কৃষি-প্রাণবৈচিত্র্য হচ্ছে পরিবেশবান্ধব চাষপদ্ধতির এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানোর পূর্বশর্ত। কৃষি-প্রাণবৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে গেলে পৃথিবীব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক খাদ্য সার্বভৌমত্ব বিশাল হুমকির মুখে পড়বে।

বীজ বা প্রাণের উপর পেটেন্ট আরোপ করার সময় নীতি-নির্ধারকবৃন্দের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয় নি যে, বীজকে কোম্পানির হাতে তুলে দিলে কৃষকের অধিকার খর্ব হবে, প্রাণবৈচিত্র্য ধ্বংস হবে, কৃষকের পরম্পরাগত জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবে এবং সর্বোপরি স্থিতিশীল খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যাবে। বর্তমানে এসকল বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও, বহুজাতিক কোম্পানিগুলো রাজনৈতিক কৌশল ব্যবহার করে জিনগত পরিবর্তিত বীজ তৈরি ও প্রচার করছে এবং তারা এটিকে জলবায়ু সহিষ্ণুর (ক্লাইমেট স্মার্ট) মত বিভিন্ন নামে পরিচিত করছে। যদিও এসব বীজ পরিবেশ, জলবায়ু ও জনস্বাস্থ্যের উপর কি প্রভাব ফেলবে তা এখনও বোঝা যায়নি।

৫.৩ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (Free trade agreement)

১৯৯৪ সালে ২০টি রাষ্ট্র মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করে। পেটেন্ট ও এই চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি সুযোগ নেয়া শুরু করে এবং এক পর্যায়ে আমেরিকায় উৎপাদিত মোট খাদ্যের প্রায় ৪৩ ভাগ অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে। এছাড়া আরও ৩টি চুক্তি, যথা- টিপিপি, ট্রান্সআটলান্টিক চুক্তি ও টিটিআইপি, স্বাক্ষরের মাধ্যমে আমেরিকার বীজ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক প্রভৃতি বিভিন্ন কোম্পানি কর্তৃক রপ্তানির জন্য সহায়ক হয়। প্রথমদিকে অনেকগুলো বহুজাতিক কোম্পানি এসব ব্যবসার সাথে জড়িত থাকলেও, পরবর্তিতে তারা একীভূত হয়ে ১০ টি বড় কম্পানিতে পরিণত হয় (এগ্রোপলি)। বৈশ্বিক বীজের ৬৭% এর মালিক ঐ ১০ টি কোম্পানি হচ্ছে: আমেরিকার মনস্যান্টো, ডুপন্ট ও ল্যান্ড-ও-লেকস; সুইজারল্যন্ডের সিনজেনটা; ফ্রান্স এর গ্রুপ লিমাগ্রেইন; জার্মানীর কেডব্লিউএসএজি ও বায়ার; জাপানের সাকাতা ও টাকিল এবং ডেনমার্কের ডিএলএফ-ট্রাইফোলিয়াম। এই কোম্পানিগুলো কৃষির সাথে জড়িত বিভিন্ন কোম্পানি কিনে নিয়ে ঐসব কোম্পানির পেটেন্টসমূহেরও মালিকানা পেয়ে গেছে।

বৈশ্বিক বীজ ও খাদ্য ব্যবস্থা এই বহুজাতিক কোম্পানিগুলো কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে তা সরকার ও কৃষকদের পক্ষে বোঝাটা কঠিন। ২০১১ সালে বৈশ্বিক বাণিজ্যিক বীজের বাজার ছিল প্রায় ৩৪.৫ বিলিয়ন ডলারের। মাত্র ৩ টি কোম্পানি (মনস্যান্টো, ডুপন্ট ও সিনজেনটা) এই বাজারের ৫৩% নিয়ন্ত্রণ করে। এমনকি মনস্যান্টো একাই ২৬%- এর মালিক হয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বীজ বিক্রেতা কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে।

৬. জিএমও বীজের আবির্ভাব

নব্বই এর দশকে উদ্ভাবিত ও ব্যাপকভাবে প্রচারিত জিএমও শস্য ও প্রাণী শুরু থেকেই ছিল বিতর্কিত। আমেরিকার মনস্যান্টো কোম্পানি এর কর্ণধার। প্রাণীর বা উদ্ভিদের বিভিন্ন রকম বৈশিষ্ট্যের সংকেত যেসব অণুরা বংশধারায় বহন করে তাদের বৈজ্ঞানিক নাম জিন বা বংশাণু।[১০] অর্থাৎ এই জিনগুলোই ঠিক করে দেয় যে প্রাণী বা উদ্ভিদটি কেমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হবে। আর ঐ জিনগুলো প্রাণীর কোষে যখন বিন্যস্ত থাকে তখন তাদের একত্রে জিনশৃঙ্খল (DNA) বলে। এই জিনশৃঙ্খলে ভিন্ন রকম জিনশৃঙ্খলসমৃদ্ধ প্রাণী বা উদ্ভিদের জিন সংযুক্ত করে জিএমও বীজ তৈরি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ যদি কোন জীবের কোন একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিজের গোত্রের মধ্যে না থাকে, যেমন কোন একটি উদ্ভিদের কোন নির্দিষ্ট পোকা প্রতিরোধী ক্ষমতা, তখন অন্য জীব থেকে সেই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জিনটি ঢুকিয়ে ঐ উদ্ভিদের কোন নির্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বদল করা যায়। এভাবে সেই উদ্ভিদটি কাঙ্ক্ষিত নতুন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়।

মনস্যান্টো কোম্পানি সয়াবিন, ভূট্টা, তুলা ও রেপসিডের জিএমও বীজ বের করেছে ও পেটেন্ট নিয়েছে। ২০০৭ সালের হিসাব অনুযায়ী আমেরিকার ১৩৬.৫ মিলিয়ন একর, আর্জেন্টিনার ৪৫ মিলিয়ন একর, ব্রাজিলের ২৮.৮ মিলিয়ন একর, কানাডার ১৫.৩ মিলিয়ন একর, ভারতের ৯.৫ মিলিয়ন একর, চীনের ৮.৮ মিলিয়ন একর, প্যারাগুয়ের ৫ মিলিয়ন একর ও দক্ষিণ আফ্রিকার ৩.৫ মিলিয়ন একর জমিতে জিএমও শস্যের চাষ হচ্ছে, যার ৯০ ভাগ বীজই মনস্যান্টো কোম্পানির পেটেন্ট নেওয়া। পৃথিবীতে চাষ হওয়া জিএমও বীজের ৭০ ভাগ হচ্ছে 'রাউন্ডআপ-সহনশীল'। রাউন্ডআপ মনস্যান্টো কোম্পানিরই তৈরি আগাছানাশক বিষ। জিএমও বীজের বাকী ৩০ ভাগ হচ্ছে বিটি টক্সিন নামক একটি বিষাক্ত কীটনাশক জিনসমৃদ্ধ।

৭. জিএমও বিষয়ক সমালোচনা ও রাজনীতি

লেসলি ডৌন্ট এর মতে 'এখন পর্যন্ত যে অবস্থা, তাতে জিন প্রকৌশলজাত খাদ্য ও শস্যের কোন স্বাধীন নিরাপত্তা পরীক্ষা বা লেবেলিং করা হচ্ছে না, এবং মানুষ না জেনেই জিএমও খাদ্য গ্রহণ করছে। এছাড়া এগুলো কতটা অস্বাস্থ্যকর ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর তা জানা যায়নি'।[১১] অর্থাৎ এই পরিবর্তিত বীজ থেকে উৎপাদিত খাদ্যের পার্থক্য করার (লেবেলিং) কোন সুষ্ঠ পদ্ধতি বা নীতিমালাও অনেক দেশেই নেই, বা থাকলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা অনুসরণ করা হয় না, ফলে ঐ খাদ্য কিভাবে উৎপাদিত হয়েছে তা জানার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ক্রেতারা। যেমন: বাংলাদেশে একজন ক্রেতা যদি বাজারে বেগুন কিনতে যায়, তাহলে সে বুঝতে পারবে না যে কোনটা জিনগত পরিবর্তিত বেগুন (বিটি বেগুন) আর কোনটা স্বাভাবিক বেগুন, কারণ কোন প্রকার লেবেল ছাড়াই বিটি বেগুন বিক্রি করা হচ্ছে। এছাড়া এই পরিবর্তিত বীজ অন্যান্য গাছের বা প্রাণীর উপর তথা পরিবেশে কি প্রভাব ফেলবে তাও এখনও যথাযথ পরীক্ষা করে দেখা হয়নি।

এরকম নানান ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে পৃথিবীর অনেক দেশই এখনও জিএমও গ্রহণ করেনি। ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালী ও রাশিয়াসহ পৃথিবীর ৩৮ টি দেশ জিএমও শস্য আবাদে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।[১২] প্রকৃতপক্ষে জিএমও গ্রহণ বা বর্জন করা, বড় বড় বহুজাতিক কোম্পানি ও রাষ্ট্রের মধ্যেকার গভীর রাজনীতির ব্যাপার।

৮. বীজ যুদ্ধ ও বীজের সার্বভৌমত্ব হরণ

বীজ যুদ্ধ হচ্ছে কৃষকের বীজ সংগ্রহ, চাষ, সংরক্ষণ ও বিনিময়ের অধিকার ও স্বাধীনতা নিয়ে বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানির সাথে কৃষক, রাজনীতিবিদ, একটিভিস্ট ও নাগরিক সমাজের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। এখন মাত্র চারটি বহুজাতিক কোম্পানি -ডুপন্ট, মনসান্টো, সিনজেন্টা এবং বেয়ার- পুরো পৃথিবীর বীজ বাণিজ্যের প্রায় ৫০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করে। কৃষকের কাছ থেকে বীজ নিয়েই ঐ কোম্পানিগুলো হাইব্রিড ও জিএমও বীজ উৎপাদন করেছিল এবং পরবর্তিতে দুঃখজনকভাবে বীজের উপর কৃষকেরই সার্বভৌমত্ব হরণ করা হয়েছে। এ বিষয়গুলো নিয়ে অনেকেই এখন প্রশ্ন তুলছে। বীজের উপর কৃষকের এই অধিকার বিষয়ক ধারণার উদ্ভব হয়েছিল ১৯৮০-র দশকে।[১৩]

খাদ্য উৎপাদনের প্রথম ধাপ হচ্ছে বীজ, তাই এই বীজ যুদ্ধ হচ্ছে মূলত খাদ্য নিয়ে যুদ্ধ। বিশেষ করে বাজারে লেবেল দেখে জিএমও খাদ্য চিহ্নিত করতে পারার অধিকার নিয়ে যুদ্ধ। এখানে অধিকারের লড়াইটা মূলত জনগণ ও কোম্পানির মধ্যে। অর্থাৎ একদিকে জনগণ কি খাবে তা জানা ও জনগণেরই ঠিক করতে পারার

অধিকার, আবার অন্যদিকে বিভিন্ন আইনের সহায়তায় কোম্পানি কর্তৃক জোরপূর্বক জনগণকে খাওয়ানোর অধিকার জারি রাখা। ভারতের সুপ্রীম কোর্ট এজন্য একটি টেকনিকাল বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করেছে, যাদের কাজ হচ্ছে জিএমও এর ব্যাপারে বৈজ্ঞানিক জৈব-নিরাপত্তা পর্যালোচনা করে পরামর্শ দেওয়া।[১৪] কেননা, জিএমও এবং প্যাটেন্টেড হাইব্রিড বীজ জীববৈচিত্র্য হ্রাস করছে, বীজ সংরক্ষণের ব্যাপারে কৃষকের অধিকার হরণ করছে এবং লাইসেন্স প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পূর্ণ বাজারকে একচেটিয়াভাবে দখল করছে। এছাড়া ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্য বিটি তুলার বীজ বিক্রি নিষিদ্ধ করেছে।[১৫]

এসব কারণে বর্তমান বাণিজ্য চুক্তিগুলো সংস্কার করে বীজের পেটেন্ট এবং জৈবিক প্রক্রিয়া সম্পর্কিত উদ্ভাবন সীমাবদ্ধ করার ব্যাপারে পুনর্ভাবনা শুরু হয়েছে। এখন দেখার বিষয় যে, সরকার বড় কোম্পানিগুলোর নিয়ন্ত্রণ থেকে ক্ষুদ্র কৃষকদের রক্ষার জন্য কি পদক্ষেপ নেয়।

৯. বীজ অধিকার বিষয়ক পদক্ষেপসমূহ

৯.১. ইউপিওভি এ্যাক্ট ১৯৬১

১৯৬১ সালের উদ্ভিদের নতুন জাতের নিরাপত্তা বিষয়ক আন্তর্জাতিক নীতিমালা (International Convention for the Protection of New Varieties of Plants) অনুযায়ী, এখনও উদ্ভিদের জিনগত উপাদানসমূহ প্রজননের জন্য মুক্তভাবে যে কেউ পেতে পারে এবং কৃষকরা তাদের চাষ করা শস্যের বীজ রাখতে পারে।

৯.২. আইএএএসটিডি (IAASTD)[১৬]

আইএএএসটিডি (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development) ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস, গ্রামীণ জীবনধারার উন্নতি এবং সমতাভিত্তিক ও সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে কিভাবে কৃষি বিষয়ক জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিসমূহ ব্যবহার করা যায় তা পর্যালোচনা করার একটি সম্মিলিত প্রয়াস। বিশ্বব্যাংক ও জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের সহায়তায় সম্পাদিত এই কাজের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় ২০০৮ সালে। এই প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিগত কয়েক দশকে কৃষিবিজ্ঞানের মূল চিন্তা ছিল নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা, যার ফলে কৃষি উৎপাদন কয়েক গুণ বেড়েছে। কিন্তু এই সফলতা এসেছে পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে। এছাড়া উন্নয়নশীল দেশগুলোর দরিদ্র মানুষেরা, যারা এই উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও সবচেয়ে কম লাভবান হয়েছে, তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধান হয়নি। বর্তমানে পৃথিবীতে একদিকে যেমন অসম উন্নয়ন ও প্রাকৃতিক সম্পদের সুস্থায়ী ব্যবহার কম হচ্ছে, অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ প্রভাব দেখা যাচ্ছে এবং দারিদ্র্য ও অপুষ্টিজনিত সমস্যাগুলো থেকেই যাচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের সুস্থায়ী কৃষির জন্য জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি বা এগ্রোইকোলজি করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে স্থানীয় ইকোসিস্টেম ও সংস্কৃতি টিকিয়ে রেখে সেই অনুযায়ী বৈচিত্র্যপূর্ণ চাষাবাদের মাধ্যমে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন এবং পরিবেশের অবক্ষয় রোধ করে সমতাভিত্তিক উন্নয়ন ও সুস্থায়ীত্বের কথা বলা হয়। বরাবরের মত যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার সরকার এই প্রতিবেদন স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছিল, তবে তারা এই প্রতিবেদনকে মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বাগত জানিয়েছে।

৯.৩. জৈবিক বৈচিত্র্য কনভেনশন (Convention on Biological Diversity)

খাদ্য ও কৃষির জন্য উদ্ভিদের জেনেটিক সম্পদ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) ও জৈবিক বৈচিত্র্য কনভেনশন অনুযায়ী উদ্ভিদের জেনেটিক সম্পদের ব্যবহার সুস্থায়ীভাবে করতে হবে এবং এর সুফলের ভাগ ন্যায্য ও সমতাভিত্তিক হতে হবে।

৯.৪. সেন্টার ফর ফুড পলিসি

সেন্টার ফর ফুড পলিসির মতে কৃষি উপকরণ সরবরাহকারী কোম্পানিদের অনুকূলে একচেটিয়া ব্যবস্থার ফলে দরিদ্র কৃষকরা বীজের উপর অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ বীজ তাদের বেঁচে থাকার জন্য সবচেয়ে কার্যকরী সম্পদ। আর এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খাবারের দাম বেড়ে যাচ্ছে, ফলশ্রুতিতে তারা খাবার সংগ্রহ করতে পারছে না। বীজের জন্য কোম্পানির উপর নির্ভর করার ফলে কোম্পানিগুলো মাত্র কয়েকটি প্রজাতির শস্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ বীজ সরবরাহ করে। এর ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর ব্যাপক সংখ্যক জনগণ পুষ্টি নিরাপত্তাহীনতায় ভোগার পাশাপাশি স্থানীয় মিশ্র চাষ পদ্ধতিগুলো ও জীববৈচিত্র্য হারিয়ে ফেলছে।

৯.৫. জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থা (FAO)

২০১১ সালের নভেম্বরে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থার ১৪৩ তম অধিবেশনে নিচের কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সহায়তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়:

- সামাজিক (কমিউনিটি) বীজ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে জাত ও বীজ বিষয়ে কৃষকের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- স্থানীয় পর্যায়ে কৃষকের আয় বহুমুখীকরণ এবং বীজের চাহিদা পূরণের জন্য মূল্য-সংযোজনমূলক কার্যক্রম বৃদ্ধি করা।
- অনানুষ্ঠানিক খাতে বীজের গুণগত মান উন্নত করা ও কৃষকের বীজের সংখ্যাবৃদ্ধির সামর্থ্য জোরদার করা, বিশেষ করে জরুরি অবস্থার উত্তরণে এবং যেখানে বেসরকারি খাত নেই সেখানে।

৯.৬. ব্রীহি[১৭]

ভারতে কোম্পানি নির্ভর আধুনিক ধানের বীজের দাপটে স্থানীয় জাতগুলো ক্রমে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। এই প্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালে ড. দেবল দেব স্থানীয় ধানের জাত সংরক্ষণ ও কৃষকদের সাথে অবাণিজ্যিক বীজ বিনিময়ের জন্য ব্রীহি নামক একটি স্থানীয় জাতের ধানের (folk rice varieties) বীজ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইনসহ বিভিন্ন দেশের কৃষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা জীবন্ত বীজের এই ব্যাংকটি উড়িষ্যার রায়েগড়া জেলায় অবস্থিত। এই বীজ ব্যাংক বর্তমানে প্রায় ১,২০০ স্থানীয় ধানের জাতসহ অন্যান্য শস্য, সেন্টার ফর ইন্টারডিসিপ্লিনারি-র গবেষণা খামার বসুধার মাটিতে প্রতি মৌসুমে চাষ করে সংরক্ষণ করছে। ব্রীহি মনে করে যে ঐতিহ্যগতভাবেই শস্যের বীজ একটি সর্বজনীন বিষয় (commons), যা সমাজেরই (community) অংশ ছিল, এবং এটিকে বানিজ্যিকভাবে দখল করার কোন সুযোগ নেই। তাই ব্রীহি শুধু কৃষকদের সাথে বীজ বিনিময়ই করছে না, বিভিন্ন এলাকার কৃষকদেরকেও নিজস্ব কমিউনিটি বীজ ব্যাংক স্থাপনের জন্য উৎসাহ যোগাচ্ছে ও প্রয়োজনীয় জ্ঞান প্রচারের ব্যবস্থা করছে।

৯.৭. গ্রিনপিস[১৮]

আন্তর্জাতিক অলাভজনক পরিবেশবাদী প্রতিষ্ঠান গ্রিনপিস প্রাণের উপর পেটেন্ট এর বিরোধিতা করে আসছে। পৃথিবী যাতে জীববৈচিত্র্যের বসবাসের উপযোগী থাকে সে লক্ষ্যে গ্রিনপিস বন ধ্বংস, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও অন্যান্য পরিবেশগত ইস্যু নিয়ে সচেতনতামূলক কাজ করে। বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও প্রচারণার মাধ্যমে গ্রিনপিস তার লক্ষ্য পূরণে কাজ করে যাচ্ছে।

৯.৮. ইটিজি গ্রুপ[১৯]

ইটিজি গ্রুপ, একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন বড় বড় কৃষি উপকরণ বিক্রেতা কোম্পানি কর্তৃক কৃষি ও শিল্পজাত খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উপর নজর রাখে। তাদের মতে, তিনটি বড় কোম্পানি- মনস্যান্টো, ডুপন্ট ও সিনজেনটা- পৃথিবীর বীজ বাজারের প্রায় ৫০ ভাগের মালিক। তারাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কোন শস্য চাষ করা হবে এবং এই বাবদে কত খরচ হবে। এছাড়া তারা ভ্রান্ত প্রক্রিয়ায় জিএমও বীজ উৎপাদন করে এটিকে জলবায়ু সহিষ্ণু জাত বলে পরিচিত করাচ্ছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিজনিত তহবিল থেকে লাভবান হচ্ছে। ইটিজি গ্রুপ মনে করে পেটেন্ট গ্রহণের মাধ্যমে তথাকথিত জলবায়ু সহিষ্ণু জাতগুলো যে টাকা আয় করে নিচ্ছে, সেই টাকা জলবায়ু পরিবর্তন থেকে রক্ষা ও অভিযোজনের জন্য কৃষকবান্ধব কৌশলে খরচ করা উচিৎ। মনস্যান্টো ও বিএএসএফ ১.৫ বিলিয়ন ডলারের চুক্তি করেছে শস্যের ঘাত সহনশীলতা নিয়ে কাজ করার জন্য। এই দুই কোম্পানি ইতোমধ্যে অনেকগুলো পেটেন্ট এর মালিকানা লাভ করেছে। এর বিপরীতে কৃষক, আদিবাসী এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা বৈচিত্র্যপূর্ণ, গণতান্ত্রিক ও সার্বভৌম বিকল্প খাদ্য ব্যবস্থার জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

৯.৯. ওপেন সোর্স সিড ইনিশিয়েটিভ্[২০]

বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানির পেটেন্ট করা বীজ ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে শস্যের বীজের মুক্ত ব্যবহারের জন্য ওপেন সোর্স সিড ইনিশিয়েটিভ্ শুরু হয়েছে। বীজকে মুক্ত রাখার জন্য ওপেন সোর্স সিড ইনিশিয়েটিভ্ কৃষক, গবেষক, বিজ্ঞানী ও কর্মীদের একটি উন্মুক্ত প্রতিশ্রুতির আওতায় নিয়ে এসেছে। ওপেন সোর্স সিড ইনিশিয়েটিভ্ এর বীজের মোড়কে লেখা থাকে যে, 'এই মোড়ক খোলার মাধ্যমে আপনি লাইসেন্স, পেটেন্ট বা অন্য কোন ভাবে এই বীজগুলোর মুক্ত ব্যবহার বন্ধ না করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন। এছাড়া এই বীজ বা বীজ থেকে হওয়া পরবর্তী বীজ অন্য কাউকে দিলে বীজের উৎস ও এই প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করবেন।'

৯.১০. বারসিক (বাংলাদেশ সেন্টার ফর ইন্ডিজেনাস নলেজ)[২১]

১৯৯৭ সাল থেকে বারসিক তৃণমূল মানুষের অংশগ্রহণে বিভিন্ন কৃষিপ্রতিবেশ এলাকার কৃষকদের দীর্ঘদিনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা কৃষিব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে স্থানীয় বিভিন্ন উদ্যোগের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে কাজ করছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় রিসোর্স সেন্টার ও জীবন্ত বীজ ব্যাংক স্থাপন করে বারসিক কৃষকদের মাধ্যমে স্থানীয় বীজ, প্রাণবৈচিত্র্য ও কৃষি ব্যবস্থাপনার সংরক্ষণ, লিপিবদ্ধকরণ ও সম্প্রসারণ করছে। বারসিকের মতে এভাবে কাজ করতে যেয়ে কেবলমাত্র শস্যের উৎপাদনের হার ও প্রাণবৈচিত্র্য সংরক্ষণের হার বৃদ্ধি হয়নি বরং জীবনধারণের জন্য কৃষকদের যেসব সেবা ও সুযোগ পাওয়া দরকার সেগুলো ভোগ করতে পারছেন, তাদের সংগঠন তৈরি ও শক্তিশালী হচ্ছে এবং অন্যান্য পেশাজীবী সংগঠনগুলোর সাথে

তাদের যোগাযোগ বৃদ্ধি হয়েছে। আর এসব কিছুই কৃষকসহ পেশাজীবী মানুষের ক্ষমতায়নের দরজাকে উন্মুক্ত করে যা উন্নয়ন উদ্যোগ বা কর্মসূচীগুলোর মূল লক্ষ্য হওয়া উচিৎ।

৯.১১. উবিনীগ (উন্নয়ন বিকল্পের নীতি নির্ধারণী গবেষণা)[২২]

শুধু মানুষের খাদ্য নিশ্চিত করা নয়, সকল প্রাণ ও প্রাণীর খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উবিনীগ বাংলাদেশে নয়াকৃষি আন্দোলন শুরু করেছিল। নয়াকৃষির কৃষকরা দেশীয় বীজ সংগ্রহ, রক্ষা ও পুনরুৎপাদনে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে পরিবেশসম্মত জৈব কৃষিচর্চা করেন। এ আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষকরা নয়াকৃষি বীজ সংঘ গঠন করেছেন, যার প্রধান কাজ হচ্ছে কৃষকের ঘরে বীজ রক্ষা করা, যেন কোন ভাবেই তা হাতছাড়া না হয়। এছাড়া কৃষকের মধ্যে ঐতিহ্যগতভাবে প্রচলিত বীজ বিনিময় ব্যবস্থা সক্রিয় রাখা, যেন কোম্পানি বা বাজার থেকে বীজ কিনতে না হয়। এর পাশাপাশি প্রকৃতির প্রাণ সম্পদ রক্ষা করা। সামগ্রিকভাবে এই বীজ সংঘ বীজ ও প্রাণসম্পদ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিতরণ, বিনিময়, বীজসম্পদের বিকাশ ও বৃদ্ধি ইত্যাদি কাজে ভূমিকা রেখে খাদ্য সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

৯.১২. রিইব (রিসার্চ ইনিটিয়েটিভস্, বাংলাদেশ)

বিকল্প গবেষণা ধারার সৃষ্টির জন্য রিইব গণগবেষণা (পার্টিসিপেটরি একশন রিসার্চ) পদ্ধতি ব্যবহার করে, যেখানে জনগণ নিজেরাই গবেষণা করে নিজেদের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের কৌশল চিহ্নিত করে। কৃষকদের সাথে গণগবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি ও কৃষকের চ্যালেঞ্জ অনুসন্ধানের প্রেক্ষাপটে রিইব জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষি ম্যানুয়াল প্রকাশ করেছে। এই ম্যানুয়ালে জীববৈচিত্র্য রক্ষা ও ব্যবহার করে চাষাবাদের পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই জীববৈচিত্র্য নির্ভর চাষাবাদের প্রথম আবশ্যক উপাদান হচ্ছে- যাবতীয় শস্যের বীজ চাষীদের হাতে রাখা। গণগবেষণার মাধ্যমে কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জীববৈচিত্র্য নির্ভর কৃষিচর্চা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য রিইব কৃষক, কৃষিবিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে কর্মশালা ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান আয়োজন করে। এছাড়া কৃষি ও কৃষির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করে সুস্থায়ী কর্মসূচী নির্ধারণের জন্য রিইব কৃষক, রাজনীতিবিদ, কৃষিবিদ, গবেষক, গণমাধ্যম কর্মী, নীতি-নির্ধারক, সরকারি- বেসরকারি কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আলোচনার আয়োজন করে থাকে।

এছাড়া রোসা লাক্সেমবার্গ স্টিফটুং[২৩], মিজারিওর[২৪], ফোকাস অন দ্যা গ্লোবাল সাউথ[২৫], লা ভিয়া ক্যাম্পেসিনা[২৬] সহ পৃথিবীব্যাপী অসংখ্য আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় সংগঠন ও নেটওয়ার্ক মনে করে যে কৃষক কোন ফসল চাষ করবে সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কৃষকেরই থাকা উচিৎ এবং এইজন্য তারা স্থানীয় ফসলের জাতের সংরক্ষণ এবং চাষাবাদ সম্প্রসারণে কাজ করে যাচ্ছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বীজ বিজ্ঞান

১. ভূমিকা

পৃথিবীর যাবতীয় উদ্ভিদ বা গাছ প্রধানত দুই প্রকার, যথা সপুষ্পক উদ্ভিদ ও অপুষ্পক উদ্ভিদ। যাদের ফুল হয় তাদের সপুষ্পক ও যাদের ফুল হয় না তাদের অপুষ্পক উদ্ভিদ বলে। আম, কাঁঠাল, ধান, জবা ইত্যাদি সপুষ্পক উদ্ভিদ, আর যেগুলোতে ফুল ও ফল হয় না, যেমন মস, ফার্ণ, স্পাইরোগাইরা ইত্যাদি অপুষ্পক উদ্ভিদ।

উদ্ভিদ বিভিন্নভাবে প্রজনন বা বংশবৃদ্ধি করে। কিছু কিছু উদ্ভিদের বীজ হয়। এই বীজ থেকে নতুন উদ্ভিদ জন্ম হয়। আবার কিছু কিছু উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ (পাতা, ডাল, শেকড়, স্পোর বা অনুবীজ ইত্যাদি) থেকেও নতুন উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। আমরা এখানে উদ্ভিদের বীজ নিয়ে আলোচনা করব।

২. বীজ

উদ্ভিদবিজ্ঞানের ভাষায় বীজ হচ্ছে নিষিক্ত ডিম্বকের পরিণত রূপ। উদ্ভিদের ফুলের পরাগরেণু (পুং জননকোষ) গর্ভাশয়ে ডিম্বাণুর (স্ত্রী জননকোষ) সাথে মিলিত হয়ে নিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করে। সফল নিষেকের পর রূপান্তরিত ও পরিস্ফুটিত ডিম্বককেই বীজ বলে। ধান, গম, আমের আঁটি, কাঁঠাল বা শিমের বিচি ইত্যাদিই হচ্ছে বীজ। পরবর্তীতে বীজ থেকে নতুন গাছের জন্ম হয়। গাছে সাধারণত ফুল থেকে ফল এবং ফল থেকে বীজ হয়। অনেক সময় বীজকেই আমরা ফল হিসেবে চিনি, যেমন বাদাম।

এখন আমরা সপুষ্পক উদ্ভিদের বীজ উৎপাদনের প্রধান অঙ্গ ফুল ও পরাগায়ন নিয়ে আলোচনা করব।

৩. ফুল

ফুল উদ্ভিদের বিশেষ একটি মৌসুমী অঙ্গ, যা বংশবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটি উদ্ভিদের সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন অংশ। ফুলের সাধারণত পাঁচটি অংশ আছে।[২৭] এগুলো হচ্ছে: ১) পুষ্পাক্ষ বা ফুলের ডাঁটা, ২) গর্ভকেশর, ৩) পুংকেশর, ৪) বৃতি, ৫) পাপড়ি। কোন কোন ফুলে এর চেয়ে বাড়তি কিছু অংশ থাকতে পারে। এছাড়া প্রজাতি ও জাতভেদে ফুলের অঙ্গগুলোর সংখ্যা, রং, আকৃতি ইত্যাদি ভিন্ন হয়। ফুলের অংশগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেওয়া হল:

১) **পুষ্পাক্ষ বা ফুলের ডাঁটা:** পুষ্পাক্ষ বা ফুলের ডাঁটার উপর ফুলের বাকী অংশ সাজানো থাকে।

২) **বৃতি:** ফুলের সবচেয়ে বাইরের অংশকে বৃতি বলে। বৃতি ফুলের অন্য অংশগুলোকে বিশেষত কুড়ি অবস্থায় রোদ, বৃষ্টি ও পোকা-মাকড় থেকে রক্ষা করে। সাধারণত এরা সবুজ রঙের হয়।

৩) **পাপড়ি:** পাপড়ি রঙিন হওয়ায় পোকা-মাকড় ও পশুপাখি আকর্ষণ করে এবং পরাগায়ন নিশ্চিত করে। এছাড়া এরা ফুলের অন্য অংশগুলোকে রোদ, বৃষ্টি প্রভৃতি থেকে রক্ষা করে।

৪) **পুংকেশর:** পুংকেশরের দন্ডের মত অংশকে পুংদন্ড এবং শীর্ষের থলির মত অংশকে পরাগধানী বলে। পরাগধানীর মধ্যে পরাগরেণু উৎপন্ন হয়। পরাগরেণু থেকে পুং জননকোষ উৎপন্ন হয়। এরা সরাসরি জনন কাজে অংশগ্রহণ করে।

৫) **গর্ভকেশর বা স্ত্রীস্তবক:** এর তিনটি অংশ: গর্ভাশয়, গর্ভদন্ড ও গর্ভমুন্ড। এখানে ডিম্বাণু সৃষ্টি হয় এবং পরাগরেণুর পুং জননকোষের সাথে মিলিত হয়ে নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া শেষ হয়। নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া শেষ হলেই ফল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। নিষিক্তকরণ প্রক্রিয়া গর্ভাশয়ে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে তার কারণে ধীরে ধীরে গর্ভাশয়টি ফলে পরিণত হয় এবং এর ডিম্বকগুলো বীজে রূপান্তরিত হয়।

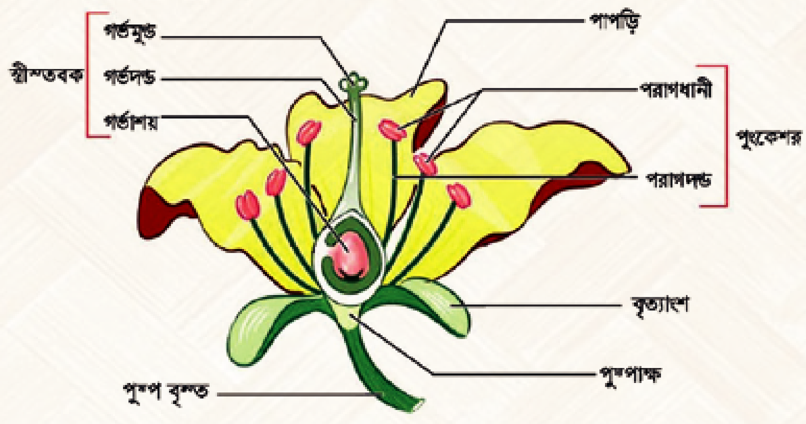

ফুলের বিভিন্ন অংশ

Soruce: https://drive.google.com/file/d/1DR37jrZTU7RgyAugr546F-KaUt2RLQlB/view

অন্যদিকে জননকোষের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে আবার ফুলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। কিছু প্রজাতির একটি ফুলেই পুং ও স্ত্রী জননকোষ উভয়ই থাকে, যেমন জুঁই, ধানের ফুল। আবার কিছু প্রজাতির ফুলে পুং ও স্ত্রী জননকোষের যে কোন একটি থাকে যেমন পেঁপে, কুমড়া বা লাউ এর ফুল।

একলিঙ্গ ও উভলিঙ্গ ফুল (ছবি ইন্টারনেট থেকে সংগৃহিত)

৪.পরাগায়ন

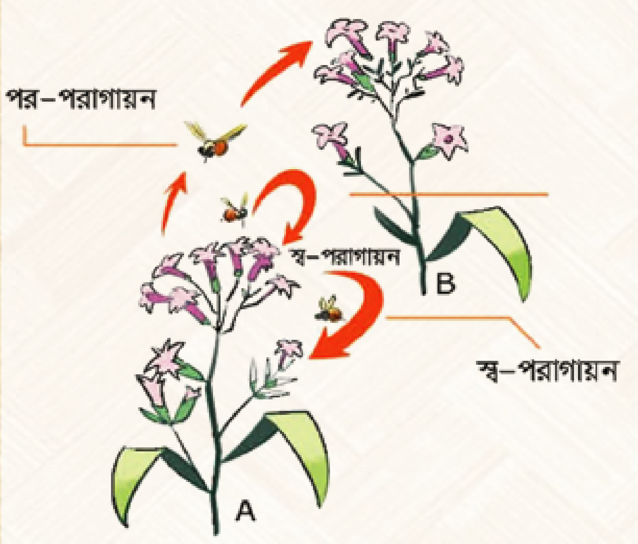

স্ব-পরাগায়ন ও পর-পরাগায়ন

Source: https://drive.google.com/file/d/1DR37jrZTU7RgyAugr546F-KaUt2RLQlB/view

ফল ও বীজ উৎপাদন প্রক্রিয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে পরাগায়ন । ফুলের পরাগধানী থেকে পরাগরেণু একই ফুলে বা একই জাতের অন্য ফুলের গর্ভমুন্ডে স্থানান্তরিত হওয়াকে পরাগায়ন বলে । পরাগায়ন প্রধানত দুই ভাবে হয়ে থাকে:

৪.১. স্ব-পরাগায়ন

একই ফুলে বা একই গাছের ভিন্ন দুটি ফুলের মধ্যে যখন পরাগায়ন ঘটে তখন তাকে স্ব-পরাগায়ন বলে । যেসব উদ্ভিদে স্ব-পরাগায়ন (self pollinating) ঘটে, সেগুলো সাধারণত ঐ উদ্ভিদের অন্য জাতের সাথে পরাগায়ন করে না । সেজন্য সেই জাতগুলো পরাগায়নের সময়সীমা বিবেচনায় নিয়ে পাশাপাশি চাষ করে বীজের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা যায় । এ ধরনের বীজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সহজে নষ্ট হয় না বলে সাবধানতার সাথে বাছাই ও সংরক্ষণ করে অনেক বছর পর্যন্ত চাষ করা যায় ।

৪.২ পর-পরাগায়ন

একই প্রজাতির দুটি ভিন্ন উদ্ভিদের ফুলের মধ্যে যখন পরাগরেণু সংযোগ ঘটে তখন তাকে পর-পরাগায়ন (diecious) বলে । পর-পরাগায়নের ক্ষেত্রে পরাগায়ন নির্ভর করে বায়ু প্রবাহ, মৌমাছি, পতঙ্গ, প্রজাপতি প্রভৃতির উপর । কৃষকের ক্ষেতে পরাগায়ন ঘটানোর প্রাণীর উপস্থিতি যত বেশি থাকবে উৎপাদন তত বেশি হবে । ফুলের অঙ্গ প্রতঙ্গ সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকলে কৃষক নিজেও সময়মত এ সব উদ্ভিদের পরাগায়ন করতে পারেন । আদিকাল থেকে কৃষকরা এভাবে পরাগায়ন ঘটিয়ে পছন্দমত বিভিন্ন উদ্ভিদের বিভিন্ন জাত সৃষ্টি করেছিলেন ।

পতঙ্গের মাধ্যমে ও হাত দিয়ে পরাগায়ন (ছবি সংগৃহিত)

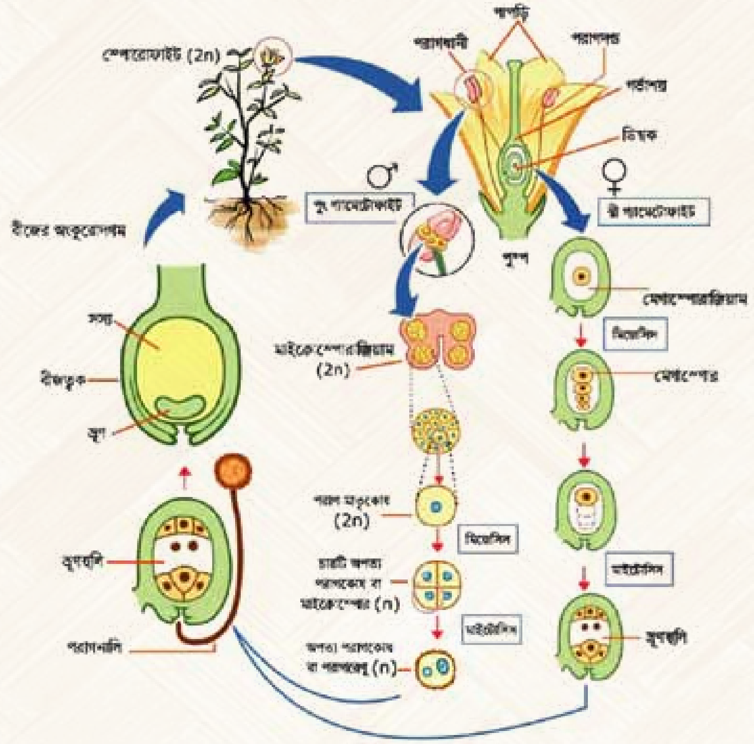

গাছের জীবন চক্র

Source: https://drive.google.com/file/d/1DR37jrZTU7RgyAugr546F-KaUt2RLQlB/view

৫. বীজের প্রকারভেদ

বীজের বাইরের আবরণ থাকা বা না থাকার ভিত্তিতে উদ্ভিদ প্রধানত দুই প্রকার হয়ে থাকে, যথাঃ আবৃতবীজী ও নগ্নবীজী। যে সকল উদ্ভিদের বীজের আবরণ থাকে, যেমন ধান, আতা, বেগুন ইত্যাদিকে আবৃতবীজী উদ্ভিদ বলে। এই আবরণযুক্ত বীজকে আমরা ফল, সবজি বা দানাশস্য প্রভৃতি হিসেবে চিনি। অন্যদিকে সাইকাস ও পাইনাস উদ্ভিদের বীজে কোন আবরণ থাকে না, তাই এদেরকে নগ্নবীজী উদ্ভিদ বলে।

বীজ প্রাকৃতিকভাবেই সৃষ্টি হয়। তবে মানুষ এই প্রাকৃতিক পদ্ধতির মধ্যে হস্তক্ষেপ করে নিজেদের পছন্দসই বীজ উৎপাদনের কৌশলও আয়ত্ত করেছে। কৃষিকাজে আমরা এখন যেসব বীজ ব্যবহার করি, সেগুলোকে পরিচিতির উপর নির্ভর করে চার ভাগে ভাগ করা যায়:

১. স্থানীয় বা দেশীয় বীজ

২. উচ্চ ফলনশীল বীজ (High Yielding Variety Seed)

৩. হাইব্রিড বীজ (Hybrid Seed)

৪. জিনগত পরিবর্তিত বীজ (Genetically Modified Seed)

নিচে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল:

৫.১ স্থানীয় বা দেশীয় বীজ

হাজার হাজার বছর ধরে অগণিত কৃষক শস্যের আদিম কোনও জাত থেকে পছন্দমত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বাছাই করে নতুন নতুন অজস্র জাতের শস্য চাষ করেছেন ।[২৮] এ ধরনের বীজ থেকে যেসব উদ্ভিদের জন্ম হয়, সেগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ করলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম একই বৈশিষ্ট্য নিয়ে টিকে থাকতে পারে । এই বীজগুলো কৃষকরা বংশ পরম্পরায় চাষ ও সংরক্ষণ করছেন । নির্দিষ্ট ভৌগলিক পরিবেশে সৃষ্ট এসব বীজ পরবর্তীতে বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং খাপ খাইয়ে নেয় । এ কারণে এই জাতগুলোর অধিকাংশই বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন স্থানীয় নামে পাওয়া যায় ।

হেয়ারলুম বীজ: এ ধরনের বীজগুলো কোন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বা পরিবার কর্তৃক প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চাষ করা হচ্ছে ।

৫.২ উচ্চ ফলনশীল বীজ

অনেক সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ উপকরণ (রাসায়নিক সার, পানি, বালাই ব্যবস্থাপনা) নির্ধারিত সময়ে ব্যবহার করে সংকর বীজের কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করানো হয় । এভাবে যেসব বীজ উচ্চ ফলনের জন্য প্রস্তুত করা হয় সেসব বীজকে উচ্চ ফলনশীল বা উফশী বীজ বলা হয় । এই জাতের বীজগুলো চাষের সময় নির্ধারিত কৃষি উপকরণ ব্যবহার না করলে বীজের কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে না, অর্থাৎ আশানুরূপ ফলন হবে না । উদাহরণস্বরূপ ধানের উফশী জাত ব্রি ধান ২৮ এর কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পাওয়ার জন্য সুপারিশকৃত মাত্রায় রাসায়নিক সার, পানি ও বালাই ব্যবস্থাপনা প্রয়োগ করতে হবে । বাংলাদেশে বীজের প্রত্যয়ন দেওয়ার জন্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী আছে । উচ্চফলনশীল বীজ তৈরির পদ্ধতিকে সংক্ষেপে পারস্পরিক জননক্রমে প্রাপ্ত প্রকরণ বলা হয়, যার ধাপগুলো হচ্ছে:

- পছন্দমত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুইটি জাত বাছাই;
- ঐ দুইটি জাতের পরাগায়নের সময় জেনে নেওয়া ও সমন্বয় করা;
- যেটিকে মা গাছ করা হবে, সেটির পুংকেশর (যেখানে পরাগরেণু থাকে) ফুল ফোটার আগেই কেটে ফেলা;
- হাত দিয়ে অন্য জাতের গাছটির পরাগরেণু নিয়ে মা গাছের আঠালো গর্ভকেশরে লাগিয়ে দেওয়া;
- এরপর ঐ গর্ভকেশরে যাতে আর অন্য পরাগরেণু প্রবেশ না করতে পারে, সেজন্য কাগজ দিয়ে মুড়ে দেওয়া;
- ধান পেকে গেলে বীজ সংগ্রহ করা;
- অন্তত ৭- ১০ মৌসুম ঐ জাতগুলো বিভিন্ন পরিবেশে নিয়মিত চাষ করে কোন পরিবেশে উপযোগী তা দেখা এবং একই কাঙ্ক্ষিত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হচ্ছে কিনা ও স্থিতিশীলতা (stable) থাকছে কিনা তা পরীক্ষা করা ।

ধানের দুইটি জাতের মধ্যে প্রজনন করানো হচ্ছে

Source: https://www.youtube.com/watch?v=XlTy2J7DVYw

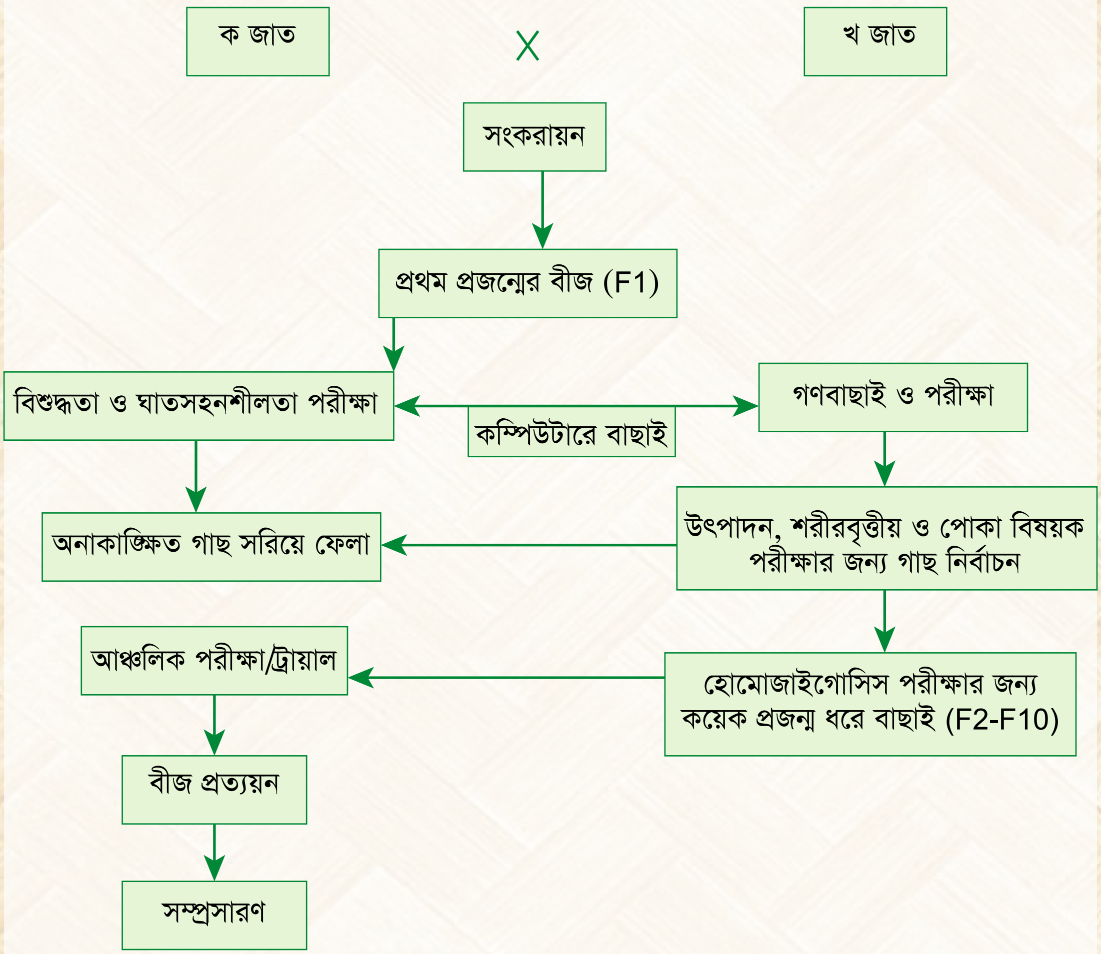

উফশী বীজ প্রস্তুত করার ধাপসমূহ

৫.৩. হাইব্রিড বীজঃ

এটি একটি নিয়ন্ত্রিত পরাগায়ন, যেখানে একই প্রজাতির দুটি ভিন্ন জাতের মধ্যে ক্রস করা হয়। হ্াইব্রিড বীজ প্রস্তত করার দুটি নিয়ম আছে। একটি হচ্ছে দুই লাইন পদ্ধতি ও আর একটি তিন লাইন পদ্ধতি। এখানে আমরা তিন লাইন পদ্ধতি ব্যবহার সমন্ধে ধারণা দিতে চাই। এভাবে বীজ উৎপাদনের ধাপগুলো হচ্ছে:

- কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন (ফলন, বালাই সহনশীলতা প্রভৃতি) জাত বাছাই করা।
- সেই জাত থেকে স্ত্রী ফুল ও নিস্ফলা পুরুষ ফুলসমৃদ্ধ বীজ উৎপাদন করে একটি লাইন তৈরি করা (cms line), একে এ লাইন বলে।
- এই লাইনকে পরাগায়ন করার জন্য আরেকটি উপযুক্ত পরাগরেণুসমৃদ্ধ বি লাইন তৈরি করা।
- প্রজনন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করার জন্য আরেকটি আর লাইন (restorer) তৈরি করা।
- ঐ তিনটি লাইনের মধ্যে পরাগায়ন করিয়ে হাইব্রিড বীজ (A x R) প্রস্তত করা যায়।

Normal Rice Spikelet (self pollinated crop) | Sterile Rice Spikelet (Male Sterility) | Hybrid Seed Production (Male Sterile x Normal Rice)

হাইব্রিড ধান বীজ উৎপাদনের ধাপসমূহ

Soruce: http://slideplayer.com/slide/3412234

এভাবে উৎপাদিত বীজ থেকে যে গাছ পাওয়া যায়, সেই গাছের ফসল উৎপাদনের ক্ষমতা ২- ৩ গুণ বেড়ে যায়। একে ইংরেজিতে hybrid vigor অথবা heterosis বলে। তবে এই গাছ থেকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বীজ সংরক্ষণ করা যায় না, কারণ পরবর্তী প্রজন্মের বীজ অধিক ফসল উৎপাদনের এই বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। এছাড়া এরকম বীজের কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পাওয়ার জন্য সুপারিশকৃত মাত্রায় উপকরণ প্রয়োগ করতে হয়।

৫.৪ জিনগত পরিবর্তিত বীজ

বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের নানান রকম জিন কেটে অন্য প্রাণী বা উদ্ভিদের কোষে যুক্ত করে জিনগত পরিবর্তিত বীজ বা জিএমও তৈরি করা হয়। যেমন কোন একটি উদ্ভিদের কোন নির্দিষ্ট পোকা প্রতিরোধী ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য, অন্য জীব থেকে সেই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জিনটি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে সেই উদ্ভিদটি পোকা প্রতিরোধী বা নতুন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়। জিনগত পরিবর্তিত বীজ সৃষ্টির ধাপসমূহ:

- অন্য প্রজাতির উদ্ভিদ বা প্রাণী বা অনুজীবের কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জিন আলাদা করা
- যেই উদ্ভিদের জিনগত পরিবর্তন করা হবে, তার জিন শৃঙ্খলে ঐ জিনটি স্থাপন করা
- এরপর টিস্যু কালচার পদ্ধতির মাধ্যমে ঐ কোষ থেকে উদ্ভিদ প্রস্তুত করা
- ঐ উদ্ভিদ থেকে বীজ উৎপাদন করা হয়।

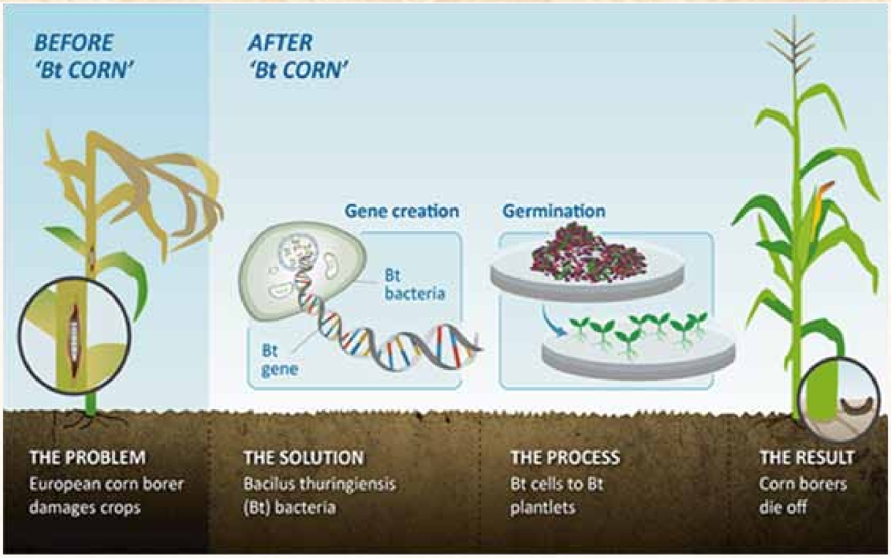

জিএমও বীজ প্রস্তুত করার ধাপসমূহ

Source: http://www.ignyc.com/our-work/portfolio/genetically-modified-corn-seed/

এভাবে বীজ উৎপাদনের জন্য যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয় তা অনেক ব্যায়বহুল। আবার যেসব উদ্ভিদে পর-পরাগায়ন হয়ে থাকে, সেগুলোর জিএমও বীজ থেকে হওয়া উদ্ভিদ আবার অন্য জাতের সাথে পরাগায়ন করে চরিত্র পরিবর্তন করতে পারে।

৬. টিস্যু কালচার

একই গঠন বিশিষ্ট একগুচ্ছ কোষ একত্রিত হয়ে যদি একই কাজ করে এবং তাদের উৎপত্তিও যদি একই হয় তাদের টিস্যু বলে। গাছের একটি টিস্যু থেকে কালচার করে ঐ গাছের মতই অনেকগুলো চারা গাছ অল্প সময়ে তৈরি করা যায়। এই পদ্ধতিকেই টিস্যু কালচার বলে। এভাবে সৃষ্ট গাছ থেকে যে বীজ হয় সেগুলোও 'ট্রু টু টাইপ', অর্থাৎ প্রজন্মের পর প্রজন্ম একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হবে।

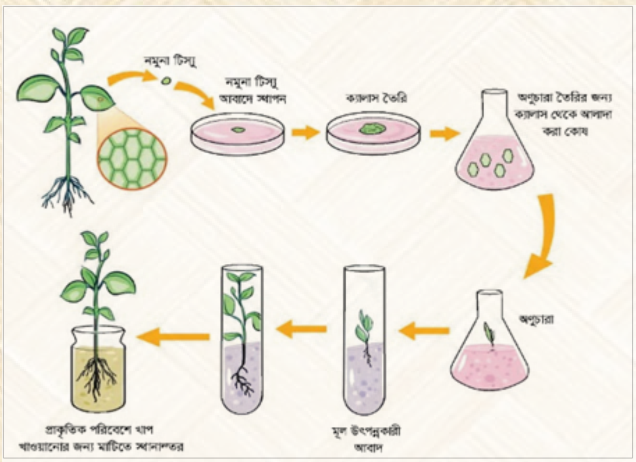

টিস্যু কালচার পদ্ধতি

Source: https://drive.google.com/file/d/1DR37jrZTU7RgyAugr546F-KaUt2RLQlB/view

অনেক সময় উচ্চফলনশীল বীজ তৈরির ক্ষেত্রে প্রথম প্রজন্মের (F1) শস্যের পরাগরেণুর টিস্যু কালচার করে একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন অনেকগুলো গাছ তৈরি করা হয়। যদি টিস্যু কালচার করা দ্বিতীয় প্রজন্মের (F2) বীজ বা গাছগুলোও কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয় তাহলে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির প্রত্যয়ন সাপেক্ষে চাষের জন্য এই বীজগুলো ছাড়া হয়। বাংলাদেশে টিস্যু কালচার করে ব্রি ধান ৮৬ জাতের উফশী বীজ প্রস্তুত করা হয়েছে। নিচের ছবিতে টিস্যু কালচার করার পদ্ধতি দেখানো হয়েছেঃ

টিস্যু কালচার (ছবি ইন্টারনেট থেকে সংগৃহিত)

৭. বীজ ও এগ্রোইকোলজি

অঞ্চলভিত্তিক বৈচিত্র্যপূর্ণ বীজ ছাড়া আমাদের খাদ্য উৎপাদন বিভিন্ন বালাই ও জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকির মুখে পড়বে। বিভিন্ন প্রজাতির ও প্রজাতির বিভিন্ন জাতের শস্যের চাষ খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করে এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও ঐতিহ্যবাহী কৃষিচর্চাগুলো টিকিয়ে রাখে। আর বীজ নিরাপত্তা তখনই আসবে যখন বীজের সার্বভৌমত্ব অর্জিত হবে এবং সমাজের মধ্যে বিনা বাধায় বীজ ব্যবহার ও বিনিময় করা যাবে। এগ্রোইকোলজি বা জীববৈচিত্র্য নির্ভর চাষাবাদ মূলত ঐতিহ্যবাহী ও স্থানীয় জ্ঞানের উপর নির্ভর করে এবং স্থানীয় সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত। সুস্থায়ী ও স্থিতিস্থাপক ইকোসিস্টেম গড়ে তোলার মাধ্যমে এগ্রোইকোলজি খাদ্য সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা দেয়। বীজ সংরক্ষণ বিভিন্ন সমাজের সংস্কৃতির অংশ এবং অনেক আগে থেকেই চর্চা করা হচ্ছে। এই ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানকে আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত করে চাষাবাদই এগ্রোইকোলজি।

৮. উপসংহার

বীজ নির্বাচন, সংগ্রহ, বাছাই, সংরক্ষণ ও চাষের মাধ্যমে আমাদের কৃষি বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। তাই বীজের জীবনচক্র ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে জানাটা কৃষকের জন্য একান্ত দরকার। আদি কৃষকরা এ ব্যাপারে দক্ষ থাকলেও বর্তমানে বীজ বিষয়ক জ্ঞান ক্রমেই লোপ পাচ্ছে। এখন বিভিন্ন সংস্থা ও কোম্পানি আদি কৃষকের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এর সাথে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বীজ উৎপাদন করছে। কৃষকরা বীজের জন্য বাজারের উপর নির্ভরশীল হয়ে যাওয়াতে বীজ উৎপাদন ও জীবন চক্র থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কিন্তু কৃষকরা বীজ সম্পর্কে ভালভাবে জানলে তার কৃষি ব্যবস্থাপনার উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ থাকবে এবং খামারের উপাদানগুলো ব্যবহার করে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করতে পারবে। বীজ ও বীজের জীবনচক্র নিয়ে যাতে

কৃষকরা আরও দক্ষ হয়ে উঠেন এবং কৃষি খামারে জীববৈচিত্র্য লালন করতে পারেন, সেজন্য বীজ সম্পর্ক জানাটা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে খাদ্য ও অন্যান্য কৃষি পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে ভোক্তা সমাজ বিচ্ছিন্ন। কৃষি জমির ক্যাশ কন্ট্রাক্ট আর কোম্পানি ও সুপার মার্কেট নির্ভর বাজারের ফলে খোদ কৃষক ছাড়া আর কারও কৃষি নিয়ে জানার কোন দায় নেই। এই বিচ্ছিন্নতা ঘোচাতে প্রথম পদক্ষেপ হতে পারে বীজের বিজ্ঞান ও রাজনীতি নিয়ে জানা ও অন্যকে জানানো।

তথ্যসূত্র

১. দেবল দেব, লুঠ হয়ে যায় স্বদেশভূমি, উৎস মানুষ প্রকাশন, কলকাতা, ২০০০, পৃষ্ঠা ৪।

২. BRAC. Rice Biodiversity in Bangaldesh: Adoption, Diffusion and Disappearance of Varities. Dhaka. 2013 p. 1

৩. https://en.wikipedia.org/wiki/Svalbard_Global_Seed_Vault

৪. দেবল দেব, পূর্বোল্লিখিত, পৃষ্ঠা ১৩।

৫. https://www.agrilicious.org/glossary/seed-sovereignty

৬. https://www.lexiconoffood.com/definition/definition-seed-sovereignty

৭. http://seedfreedom.info/

৮. https://en.wikipedia.org/wiki/DuPont_Pioneer

৯. http://en.widipedia.org/widi/DuPont_Pioneer

১০. দেবল দেব, পূর্বোল্লিখিত, পৃষ্ঠা ২৪।

১১. Lesley Daunt May 2014, Huffington Post GM Proponents Claim Genetic Engineering Is Just an Extension of Natural Plant Breeding

১২. https://sustainablepulse.com/2015/10/22/gm-crops-now-banned-in-36-countries-worldwide-sustainable-pulse-research/#.WmA9SpJEnIV

১৩. Mooney, P. 2011. International non-governmental organizations. The hundred years (or so) seed war-Seeds, sovereignty and civil society - A historical perspective on the evolution of 'The law of the seed'. In Plant genetic resources and food security, eds. C. Fresno, F. Lopez, and J.T. Esquinas-Alcazar, 135-48. New York: FAO, Biodiversity International and Earth scan

১৪. http://www.thehindu.com/sci-tech/agriculture/Global-scientists-back-10-year-moratorium-on-field-trials-of-Bt-food-crops/article12213745.ece

১৫. https://timesofindia.indiatimes.com/india/Maharashtra-bans-Bt-cotton-seeds/articleshow/15420778.cms

১৬. https://www.greenfacts.org/en/agriculture-iaastd/
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Assessment_of_Agricultural_Knowledge,_Science_and_Technology_for_Development

১৭. http://cintdis.org/vrihi/

১৮. http://www.greenpeace.org/international/en/

১৯. http://www.etgworld.com/about.php

২০. https://osseeds.org/

২১. সুকান্ত সেন ও সিলভানুস লামিন (সম্পাদনা ও সংকলন), বাংলাদেশের কৃষিপ্রাণবৈচিত্র্য, বারসিক, ঢাকা, ২০০২, পৃষ্ঠা ৫-৭।

২২. http://ubinig.org/index.php/network/userNayakrishi/bangla

২৩. http://www.rosalux.in/

২৪. https://www.misereor.org/about-us/

২৫. https://focusweb.org/

২৬. https://viacampesina.org/en/

২৭. https://drive.google.com/file/d/1DR37jrZTU7RgyAugr546F-KaUt2RLQlB/view

২৮. দেবল দেব, পূর্বোল্লিখিত, পৃষ্ঠা ১।

RESEARCH
INITIATIVES
BANGLADESH

Research Initiatives, Bangladesh (RIB)

Research Initiatives, Bangladesh (RIB) was founded to promote knowledge on poverty alleviation that is relevant, useful, innovative, participatory and action oriented, with a special focus on marginalized and socially excluded communities. RIB views poverty as a multidimensional process and recognizes that the needs of poverty groups go beyond simple income generation, food and shelter, to areas such as equality, dignity, justice, human rights and good governance. RIB supports marginalized and minority groups who are unable to access basic services due to social discrimination and conduct people's research (*Gonogobeshona*) on the development schemes that affects them most, in order to develop ownership and generate community mobilization.

ROSA
LUXEMBURG
STIFTUNG
SOUTH ASIA

Rosa Luxemburg Stiftung (RLS)

Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) is a political foundation from Germany that works within the tradition of workers' and women's struggles. Bearing the name of Democratic Socialist Rosa Luxemburg (1871-1919), the foundation serves as a forum for debate and critical thinking about political alternatives, as well as a research centre for progressive social development. RLS promotes the discourse among activists, scientists and intellectuals from South Asia and Germany as well as from other regions of the world. A special focus lies on creating networks among countries of the Global South. The foundation also provides space for critical discourse and publishes educational material.

For more information please visit : www.rosalux.in